বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা (২০১৭-২০৪১)
জাতীয় কমিটি প্রস্তাবিত খসড়া রূপরেখা

তেল গ্যাস খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি

২২ জুলাই ২০১৭ । ঢাকা

সারসংক্ষেপ

সকল তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, দেশি বিদেশি কতিপয় গোষ্ঠীর আধিপত্য থেকে মুক্ত হলে দেশ ও জনগণের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি না করেই সর্বোচ্চ চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সাজানো সম্ভব। দেশের সম্পদ, সম্ভাবনা এবং বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে, বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দেশের জনগণ ও সরকারের কাছে আমরা এই বিকল্প মহাপরিকল্পনার খসড়া উপস্থিত করছি। এর কেন্দ্রীয় লক্ষ্য:

১. দেশের সকল নাগরিকের জন্য সুলভে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
২. দীর্ঘমেয়াদে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সম্পদের জাতীয় মালিকানা নিশ্চিত করা ও তার সর্বোত্তম ব্যবহার।
৩. সবার জন্য নিরাপদ, ঝুঁকিহীন এবং পরিবেশসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্দেশ করা।
৪. জাতীয় সক্ষমতার ওপর দাঁড়িয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামগ্রিক জীবনমান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা এই মহাপরিকল্পনা উপস্থাপন করছি:

* বর্তমান পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রীয় নীতিকাঠামো
* সরকারি মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি ২০১৬)র বৈশিষ্ট্য
* অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও পরিবেশ: বৈশ্বিক নতুন গতিমুখ
* বাংলাদেশের জ্বালানি সম্পদ, সরকারের ভূমিকা ও করণীয়
* বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনা ও বিতর্ক
* বিভিন্ন জ্বালানির তুলনামূলক খরচ
* বাংলাদেশের জন্য জাতীয় কমিটির রূপরেখা
* সরকারের সাথে তুলনামূলক অবস্থান

সরকারি মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি ২০১৬)র বৈশিষ্ট্য

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের জন্য সরকার জাপানের জাইকার কনসালট্যান্টদের মাধ্যমে ২০৪১ পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি ২০১৬) উপস্থিত করেছে। এই মহাপরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. এই 'মহাপরিকল্পনা' বিদেশি তহবিল ও বিশেষজ্ঞ নির্ভর। দলিলের 'স্টাডি টিমের' তালিকা এর প্রমাণ। ইংরেজিতে প্রণীত এই দলিলে জাপানী ব্যবসায়িক সংস্থার যুক্ততাও স্পষ্ট। এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে: Japan International Cooperation Agency (JICA), Tokyo Electric Power Services Company Limited, Tokyo Electric Power Company Holding, Inc.
২. এই 'মহাপরিকল্পনা'য় বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি, জনবসতি, সম্পদের আপেক্ষিক অবস্থান, জাতীয় সক্ষমতা, পরিবেশগত ঝুঁকি, আর্থিক সামর্থ্য, এবং জনস্বার্থের প্রশ্ন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে।
৩. এই 'মহাপরিকল্পনা' প্রণয়নের আগেই তার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন নতুন প্রকল্পের তালিকা থেকে এটি নিশ্চিত যে, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব অনুযায়ী তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।
৪. এই 'মহাপরিকল্পনা' অনুযায়ী বিদ্যুৎ খাতের প্রতিটি প্রকল্পই হবে বিদেশি কোম্পানি ভিত্তিক, আমদানি ও ঋণ নির্ভর। এছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবেশ বিধ্বংসী উচ্চ ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ উৎপাদনকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।
৫. যথাযথ পরিবেশ সমীক্ষা ছাড়া, জনসম্মতির বিরুদ্ধে, অনিয়ম, বলপ্রয়োগ করে সুন্দরবনবিনাশী রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ প্রায় ২০ হাজার মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৭২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ভয়ানক ঝুঁকিপূর্ণ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এবং সম্পূর্ণ আমদানি করা এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রকল্পকে যৌক্তিকতা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এতে।
৬. এই 'মহাপরিকল্পনা'য় দেশের স্থলভাগ এবং গভীর ও অগভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই। এছাড়াও এতে দেশীয় গ্যাস সম্পদের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক নীরবতার পাশাপাশি গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্যে সম্পূর্ণই আমদানিকৃত এলএনজি-র উপর নির্ভর করা হয়েছে। একদিকে দেশে গ্যাস সংকটের অজুহাত দিয়ে এলএনজি, কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছে, অন্যদিকে বিদেশি কোম্পানির সাথে গ্যাস রপ্তানির বিধান রেখেই একের পর এক চুক্তি করা হচ্ছে।
৭. একই কারণে মহাপরিকল্পনায় নিয়মিতভাবে গ্যাস ও বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে স্পষ্টই উল্লেখ করা আছে, 'এলএনজি আমদানি ও গ্যাসের আন্তর্জাতিক দাম

বিবেচনায় প্রতিবছর ১৯ থেকে ২৯ শতাংশ হারে গ্যাসের দামবৃদ্ধি করতে হবে।'

৮. সারাবিশ্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের গতি অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি পেলেও এই 'মহাপরিকল্পনা'য় তার কোনো প্রতিফলন নেই। বরং আন্তর্জাতিক ভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যয় দ্রুতগতিতে কমে এলেও এই দলিলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই ব্যয়ের চিত্রটি অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে।

৯. সরকারের মহাপরিকল্পনায় যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার অনেকগুলোই দেশের সংবিধান ও দেশের আইন পরিপন্থী।

গ্যাস, কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ

বাংলাদেশে জীবাশ্ম জ্বালানি বিপুল পরিমাণে না থাকলেও যতটুকু আছে তার সর্বোত্তম ব্যবহার কখনোই সম্ভব হয়নি। ১৯৮০ দশক থেকে বিভিন্ন ভুল নীতি ও দুর্নীতির অংশ হিসেবে বহুরকম ক্ষতিকর চুক্তি হয়েছে। তার ফলে দেশের সম্পদ বিপদ ও ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে।

সামগ্রিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, যথাযথ নীতিগ্রহণ করলে ২০৪১ সাল পর্যন্ত দেশের গ্যাস চাহিদা নিজেদের গ্যাস থেকেই মেটানো সম্ভব। কিন্তু সেই লক্ষ্যে (১) গ্যাস নিয়ে রপ্তানিমুখি চুক্তি বাতিল করতে হবে। (২) বাপেক্সকে কাজের সুযোগ দিতে হবে, জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এবং (৩) স্থলভাগ এবং গভীর ও অগভীর সমুদ্রে নিয়মিতভাবে অনুসন্ধান চালাতে হবে।

এটি প্রমাণিত যে, বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি, পানিসম্পদ ও জনবসতি বিবেচনায় বিদ্যমান প্রযুক্তি ও নীতিমালা মোটেই দেশের কয়লা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের উপযোগী নয়। আমরা তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে একমত যে, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যতোদিন উপযুক্ত নতুন প্রযুক্তি না আসবে ততোদিন এই কয়লা রেখে দেওয়া হবে। কেননা কৃষিজমি, পানি, ও স্থানীয় মানুষের সর্বনাশ করে, কতিপয় গোষ্ঠীর হাতে বাংলাদেশের কয়লা সম্পদ তুলে দেয়া যায় না। তাছাড়া সকল তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে-বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার আর্থিক, কারিগরি, পরিবেশগত কোনো দিক থেকেই এখন আর অনুকূল নয়। যদি বিকল্প পথে কম ব্যয়ে, কম ঝুঁকিতে, ও কম দূষণে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয় তবে সেপথ গ্রহণ করাই দায়িত্বশীল হবে। ভবিষ্যতে নতুন প্রযুক্তিতে পরিবেশ সম্মতভাবে কয়লার সর্বোত্তম ব্যবহার হয়তো করা সম্ভব হবে। কিন্তু তার জন্য দেশেও গবেষণামূলক কাজে গুরুত্ব দিতে হবে।

পারমাণবিক বিদ্যুতের দিকে যাবার ক্ষেত্রেও আমাদের নীতি পরিবর্তন করতে হবে। এর চেয়ে কম ব্যয়বহুল ও কম ঝুঁকিপূর্ণ বিকল্প পন্থা যেহেতু রয়েছে, তাই বিপজ্জনক এই নীতি গ্রহণ অপ্রয়োজনীয়। তবে পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চার জন্য একটি ৫০ বা ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র থাকতে পারে যা প্রধানত গবেষণাগার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এতে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের সক্ষমতা প্রকাশের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার নজির থাকবে।

বিভিন্ন জ্বালানির তুলনামূলক খরচ

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণা ও তথ্য সন্নিবেশ করে দেখা যাচ্ছে যে, নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ, ও একক চলতি খরচ দুক্ষেত্রেই গত ১০ বছরে দাম কমেছে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি। জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণায় দেখা যায় প্রতি ইউনিট সৌরবিদ্যুতের দাম ২০১০ থেকে ৫ বছরে কমেছে ৫৮%। ২০২৫ সাল পর্যন্ত এই দাম আরও ৫৯% কমবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। সরকারি পিএসএমপিতেও স্বীকার করা হয়েছে যে ২০৪০ পর্যন্ত সৌরবিদ্যুতের দাম প্রতি ইউনিট কমবে (৫০%), বায়ুবিদ্যুৎ কমবে (৩০%) এবং ব্যাটারীর দাম কমবে ৪৫%। অন্যদিকে জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুতের দাম বাড়বে ৪৫%। তারপরও যার দাম কমবে সেই পথে না গিয়ে যার দাম বাড়বে সরকার সেই পথেই যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে-র সমীক্ষায় বলা হয়েছে বর্তমান প্রাপ্ত প্রযুক্তিতে শতভাগ সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশে সৌরবিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব ১,২০,০০০ মেগাওয়াট, ইন্সসিটিউট অব এনার্জি এন্ড ফাইনান্সিয়াল এনালাইসি এর গবেষণা অনুযায়ী শতভাগ সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশে সৌরবিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব ২,৪০,০০০ মেগাওয়াট। আমেরিকান জার্নাল অব ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ অনুযায়ী বায়ু বিদ্যুৎ পাওযা যাবে ২০ হাজার মেগাওয়াট।

বাংলাদেশের জন্য জাতীয় কমিটির রূপরেখা

সকল দিক বিবেচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, যথাযথ নীতিমালা গ্রহণ করলে, বিদেশি কোম্পানি ও কনসালট্যান্ট নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে, কোনো ধ্বংসাত্মক পথে না গিয়ে শিল্প, কৃষি, ও পরিবহণসহ ঘরে ঘরে পরিবেশ সম্মত ভাবে এবং সুলভে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ সম্ভব। সেই লক্ষ্যে আমরা স্বল্প মেয়াদ, মধ্য মেয়াদ এবং দীর্ঘ মেয়াদকে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের মহাপরিকল্পনা বিন্যাস করেছি।

স্বল্পমেয়াদে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিদ্যমান কাঠামোতে অল্প পরিবর্তনের সুপারিশ করেছি। তবে এই সময়ে আমাদের মূল প্রস্তাবনা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনসহ জাতীয় কমিটির ৭ দফা বাস্তবায়ন। এই সময়ের মধ্যে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন করে জাতীয় সক্ষমতা বিকাশে বিপুল গবেষণা ও নিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। স্থলভাগ ও সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে বাপেক্সকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির পথে অগ্রসর হতে সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ এই সময়ের প্রধান করণীয়। ২০২১ সালের মধ্যে আমাদের প্রস্তাবিত কাঠামোতে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মধ্যে গ্যাস থেকে শতকরা ৫৯ ভাগ, তেল থেকে শতকরা ১৯ ভাগ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে শতকরা ১০ ভাগ (৫% সৌর, ৩% বায়ু এবং ২% বর্জ্য),

সরকার ও জাতীয় কমিটির মহাপরিকল্পনার তুলনামূলক অবস্থানের চিত্র

বিষয়	সরকারের কর্মসূচি	জাতীয় কমিটির বিকল্প প্রস্তাব
২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ লক্ষ্যমাত্রা	২৪৫ টেরাওয়াট -আওয়ার	২৪৫ টেরাওয়াট-আওয়ার
মূল বৈশিষ্ট্য	আমদানি ও রাশিয়া -চীন-ভারতের ঋণনির্ভর । পরিবেশ বিধ্বংসী ।	দেশের সম্পদ নির্ভর । রাশিয়া-চীন-ভারতের ঋণমুক্ত । পরিবেশ অনুকূল ।
প্রধান উৎস	কয়লা, এলএনজি ও পারমাণবিক ।	প্রাকৃতিক গ্যাস ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ।
মূল চালিকা শক্তি	বিদেশি কোম্পানি, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান, কনসালট্যান্ট	জাতীয় সংস্থা, দেশি প্রতিষ্ঠান ও জনউদ্যোগ ।
২০২১ সাল পর্যন্ত	মোট: ২৩৫০০ মেগাওয়াট । দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস: ৩৪%, এলএনজি: ১১%, কয়লা: ৩০%, তেল: ১৫%, আমদানি / নবায়নযোগ্য: ১০% ।	মোট: ২৫২৫০ মেগাওয়াট: ১৪০৬৩ মে.ও. প্রাকৃতিক গ্যাস, ৪৩৪০ মে.ও. তেল, ২৭৫৯ মে.ও. সোলার, ৯৯৩ মে.ও. বায়ু, ৩৯৭ মে.ও. বর্জ্য, ১৫৯৯ মে.ও. আঞ্চলিক সহযোগিতা, ১০৯২ মে.ও. অন্যান্য । জ্বালানির ভিত্তিতে: প্রাকৃতিক গ্যাস: ৫৯%, তেল: ১৯%, নবায়নযোগ্য: ১০% । অন্যান্য: ১২%
২০৩১ সাল পর্যন্ত	মোট:৩৪৫০০ মেগাওয়াট । কয়লা: ২৬%, এলএনজি: ১৭%, দেশের গ্যাস: ১৩%, আমদানি / নবায়নযোগ্য: ১৫% । পারমাণবিক: ১৪%, তেল: ১৫% ।	মোট: ৪৯৭ ০০ মেগাওয়াট । ১৮৪৫৯ মে.ও. প্রাকৃতিক গ্যাস, ২৬৩৭ মে.ও. তেল, ২১০১৫ মে.ও. সোলার, ৩৯৯৫ মে.ও. বায়ু, ১৭১২ মে.ও. বর্জ্য, ১৮৮৪ মে.ও. আঞ্চলিক সহযোগিতা । জ্বালানির ভিত্তিতে: প্রাকৃতিক গ্যাস: ৪৯%, নবায়নযোগ্য: ৩৯% । অন্যান্য: ১২% ।
২০৪১ সাল পর্যন্ত	মোট: ৫৭০০০ মেগাওয়াট । কয়লা: ৩৫%, এলএনজি: ২৩.৭%, দেশের গ্যাস: ১১.৩%, আমদানি / নবায়নযোগ্য: ১৫%, তেল: ৫%, পারমাণবিক: ১০% ।	মোট: ৯১৭ ০০ মেগাওয়াট । ২২৭৬৬ মে.ও. প্রাকৃতিক গ্যাস, ২৪৬১ মে.ও. তেল, ৫৩৩৯৪ মে.ও. সোলার, ৭৪৫৮ মে.ও. বায়ু, ২৭৯৭ মে.ও. বর্জ্য, ২৭৯৭ মে.ও. আঞ্চলিক সহযোগিতা । জ্বালানির ভিত্তিতে: নবায়নযোগ্য: ৫৫%, প্রাকৃতিক গ্যাস: ৩৭% । অন্যান্য: ৮% ।

অন্যান্য উৎস হতে শতকরা ৫ ভাগ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা থেকে আসবে শতকরা ৭ ভাগ বিদ্যুৎ ।

মধ্যমেয়াদে (২০৩১ পর্যন্ত) পুরনো গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস পাওয়ার হার হ্রাস পেলেও যথাযথভাবে অনুসন্ধান করলে গভীর ও অগভীর সমুদ্র থেকে নতুন পর্যায়ে গ্যাস সরবরাহ শুরু হবে। কোনো কারণে তার ঘাটতি দেখা দিলে গ্যাস আমদানিও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে। এছাড়া ততদিনে নবায়নযোগ্য উৎসগুলো ব্যবহারের সক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পাবে। এই সময়কালেও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ শীর্ষস্থানে থাকবে, শতকরা ৪৯ ভাগ। দ্বিতীয় স্থানে থাকবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, শতকরা ৩৯ ভাগ (২৭% সৌর, ৭% বায়ু, ৫% বর্জ্য), তেল শতকরা ৭ ভাগ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা শতকরা ৫ ভাগ।

দীর্ঘমেয়াদে গুণগত পরিবর্তন নিশ্চিত করে নবায়নযোগ্য উৎস থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন শীর্ষস্থানে পৌঁছাবে। সেজন্য ২০৪১ নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ৫৫ ভাগ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আনা সম্ভব হবে (এর মধ্যে সৌর: ৪২%, বায়ু: ৮%, বর্জ্য: ৫%)। দ্বিতীয় স্থানে থাকবে প্রাকৃতিক গ্যাস, শতকরা ৩৭ ভাগ। তেল ও আঞ্চলিক সহযোগিতা শতকরা ৮ ভাগ।

সরকার ও জাতীয় কমিটির তুলনামূলক অবস্থান

সরকার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে যেসব বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করেছে তার অধিকাংশই বাংলাদেশের মানুষ

সরকার ও জাতীয় কমিটির মহাপরিকল্পনায় গ্রাহক পর্যায়ে দামের তুলনামূলক চিত্র

সময়কাল	সরকারের পরিকল্পনায় বিদ্যুতের গড় দাম (চলতি দামে-টাকায়)	জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বিদ্যুতের গড় দাম (চলতি দামে-টাকায়)	সরকারের পরিকল্পনায় বিদ্যুতের গড় দাম (২০১৫ দাম স্তর অনুযায়ী-টাকায়)	জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বিদ্যুতের গড় দাম (২০১৫ দাম স্তর অনুযায়ী-টাকায়)
২০২১	১১.৫৬	৭.৬৫	৮.৫২	৫.২৩
২০৩১	৩১.৯৪	২০.০৭	১১.০২	৫.২৯
২০৪১	৭৯.১৪	৫০.১৯	১২.৭৯	৫.১০

সূত্র: সরকারের বিদ্যুতের দামের জন্য পিএসএসপি ২০১৬ পৃ. ২১-৪ এবং (summary, tariff policy: electricity tariff), এবং জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত দামের জন্য প্যানেল বিশ্লেষণ।

ও প্রকৃতির জন্য পরিবেশগত দিক থেকে ভয়াবহ, এবং অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। অবিশ্বাস্য একগুয়েমী নিয়ে সরকার সুন্দরবনবিনাশী প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে কাজ করছে। ভারত ও চীন নিজ নিজ দেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ থেকে দ্রুত সরে আসার নীতিগত, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তাদের পরিত্যক্ত প্রযুক্তি দিয়ে বাংলাদেশে তৈরি করা হচ্ছে আত্মঘাতী সব প্রকল্প। সম্প্রতি সরকার আবারও রেন্টাল ও কুইক রেন্টালের পথে যাচ্ছে এবং এর জন্য পুঁজি যোগান দিতে ব্যাংকগুলোর ওপর চাপ দেয়া হচ্ছে। সবরকম তথ্য উপাত্ত এবং বিশ্লেষণ থেকে আমরা নিশ্চিত যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এসব পথ অপরিহার্য নয়। অথনৈতিক, সামাজিক, পরিবশেগত বিচারে এর চাইতে অনেক উৎকৃষ্ট পথ আছে। আমরা সেই রূপরেখাই এখানে হাজির করেছি।

বিনিয়োগ/ দাম: তুলনামূলক চিত্র

সরকারি মহাপরিকল্পনায় ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হযেছে। উল্লেখ্য, এতে প্রাথমিক জ্বালানি খরচ অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। সর্বশেষ বাজেটে সরকার রূপপুর সহ বিভিন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করেছেন ৩১ হাজার ৩৯৩ কোটি টাকা। জাতীয় কমিটির বিনিয়োগ প্রস্তাবনায় ব্যাটারি খরচ সহ আগামী ২৫ বছরে প্রয়োজন হচ্ছে সর্বোচ্চ ১১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

দেশে ২০০৬-৭ সালে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম ছিলো গড়ে ইউনিট প্রতি ২.২৬ টাকা। গত ১০ বছরে কয়েক দফা দামবৃদ্ধির পর সর্বশেষ হিসাবে এই দাম দাঁড়িয়েছে ইউনিট প্রতি ৬.৭৩ টাকা। পিএসএমপি ২০১৬ অনুযায়ী গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম প্রতিবছর বাড়াতে হবে। সার্বিক ভাবে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পিএসএমপিতে ২০৩১ সাল পর্যন্ত ২.৬% হারে প্রকৃত দাম বৃদ্ধির প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। ২০৩১ থেকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের প্রকৃত দাম ১.৫% হারে বৃদ্ধির প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। এর ফলে সরকারি পরিকল্পনায় চলতি দামে ২০৪১ সালে বিদ্যুতের দাম বাড়বে শতকরা ৭০০ ভাগ। সূত্র: সরকারের বিদ্যুতের দামের জন্য পিএসএসপি ২০১৬ পৃ. ২১-৪ এবং (summary, tariff policy: electricity tariff), এবং জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত দামের জন্য প্যানেল বিশ্লেষণ।

জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউনিটপ্রতি বিদ্যুতের দাম হবে এর প্রায় অর্ধেক। ২০১৫ সালের দাম স্তর অনুযায়ী, ২০৪১ সালে সরকারি পরিকল্পনায় বিদ্যুতের দাম জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বিদ্যুতের দামের তুলনায় প্রায় ২ গুণেরও বেশি। প্রস্তাবিত রূপরেখায় গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে পিএসএমপিতে ব্যবহৃত পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে। সৌর ও বায়ু ভিত্তিক বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল রিনিউয়েবেল এনার্জি এজেন্সি' প্রদত্ত প্রাক্কলিত আন্তর্জাতিক দামকে অনুসরণ করা হয়েছে। তেল ভিত্তিক বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফার্নেস তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ ও ডিজেল ভিত্তিক বিদ্যুতের গড় মূল্য ধরে পিএসএমপিতে ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

নিরাপদ বৈষম্যহীন সমৃদ্ধির পথযাত্রা

সরকার যখন পশ্চাৎমুখি, লুণ্ঠন ও ধ্বংসমুখি, নিপীড়ন ও বৈষম্যমুলক এরকম উন্নয়ন চিন্তার অধীনে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তখন গত প্রায় দুদশকের জনআন্দোলনের শক্তি ও আকাঙ্খার ওপর দাঁড়িয়ে আমরা ভবিষ্যৎমুখি, প্রগতি ও সমতামুখি প্রবৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক, প্রাণ প্রকৃতি ও মানুষপন্থী উন্নয়ন চিন্তার কাঠামোতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করছি। বিপুল জনসমর্থিত চিন্তা ও আন্দোলনের ধারায় জনপন্থী মহাপরিকল্পনার খসড়া উপস্থাপন বাংলাদেশে নতুন চিন্তা ও জন আন্দোলনের শক্তিরই প্রকাশ ঘটাচ্ছে। আমরা এই খসড়া উপস্থিত করছি দেশের সকল পর্যায়ের মানুষের মতামতের ভিত্তিতে দেশে অগ্রসর উন্নয়ন চিন্তা ও বিদ্যুৎ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবার দিকনির্দেশনা চূড়ান্ত করতে। আমরা জানি, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে পরিকল্পনা আমরা প্রকাশ করেছি ভবিষ্যতে প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের ফলে এর চাইতেও উন্নততর এবং সুলভ কাঠামোতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে। এর সব লক্ষণই বিশ্বজুড়ে প্রকাশিত হচ্ছে। তবে এরজন্য প্রয়োজন হবে সব রকমের আধিপত্য থেকে মুক্ত মানুষ, ও প্রকৃতি বান্ধব উন্নয়ন দর্শন। এসবের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রীয় নীতি ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন এবং জনগণের মালিকানা ও কর্তৃত্বের বিকাশ সম্ভব।

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনগণের শতভাগ মালিকানা, খনিজসম্পদ রপ্তানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং জাতীয় সক্ষমতার বিকাশসহ জাতীয় কমিটির ৭ দফা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই এই নতুন যাত্রা শুরু সম্ভব।